মিলনসাগর
www.milansagar.com

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিন্তিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।

# জ্যোতির্ময় জ্যোতিরিন্দ্র

দোহাই পতিত পাবন হরি,
আর, নয় আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে,
দস্যু লোভগুলিকে,
চালান করো আন্দামানে।
তার মানে
স্বার্থ অর্থ
জমিদারী অনর্থ,
টাকা, টাকা আর টাকা
সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা।
শ্রান্ত শ্লথপদে তাই
তোমারই দিকে, ফিরবার প্রেরণা পাই,
হে অনবগুণ্ঠিতা,
অকুণ্ঠিতা।
পঁচিশ নম্বর মধুবংশীর গলি,
তোমায় চুপি চুপি বলি :
আকর্ষণ? অনেক অনেক আছে
তোমার শীতে ঠাসা
অমাবস্যার বাসা
ইঁট বের করা দেওয়ালের কোণে কোণে।

এই একটি কবিতাই এক নিমেষে চিনিয়ে দিয়েছিল জ্যোতির্ময় জ্যোতিরিন্দ্রকে। তিরিশের দশকের শেষ থেকেই যে বুদ্ধিজীবী, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যার সূত্রপাত ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউটে (YCI) এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে যার দৃঢ়তর রূপ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিও (১৯৪১); যা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের এবং যার পরিণতি প্রগতি লেখক সংঘ নামে খ্যাত হয়েছিল। ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে ছিল তার অফিস। যা কেবল ৪৬নং নামেও খুবই প্রচলিত ছিল। এই সংঘের অন্যতম হোতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। আমাদের বটুকদা।

একটি নাম অনন্য ব্যক্তিত্ব। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭)। তাঁর হাতে ছিল বলিষ্ঠ কলম। কণ্ঠে ছিল দুর্লভ সুর। আর চিত্তভরা ছিল মানুষের প্রতি ভালবাসা। সেই উদ্দাম প্রাণিত, অগ্নিগর্ভ সামাজিক কবি রবীন্দ্র রূপাঙ্গ মুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ভাবনায় ছিলেন নবযুগের ঘোষক। বিষ্ণুদে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায় স্পর্শিত 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অন্যতম অভিপ্রেত ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে জর্জ (দেবব্রত), হেমন্ত, সুচিত্রা মিত্র, বিনয় রায়ের মত কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নিজ গুণে অনিবার্য স্রষ্টা রূপে। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, ঋত্বিক ঘটকদের সঙ্গে গানে, নাটকে, চলচ্চিত্রে প্রাণময় বটুক ছিলেন অবশ্যম্ভাবী শিল্পী সত্তা।

মধুবংশীর গলিতে নবজীবনের গানে জ্যোতিরিন্দ্রর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে। শহরে, নগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্তে। জাগিয়ে তুলেছেন ঘুমন্ত শক্তিকে। উদ্বুদ্ধ করেছেন যৌবনকে। মধুবংশীর গলিতে শম্ভু মিত্রর কণ্ঠে, নবজীবনের গানে নতুন জোয়ারে গ্রামে শহরে

মিলনসাগর
www.milansagar.com


নগরে ও প্রান্তরে কোটি মৃত্যুকে জিনে নেবার মন্ত্রশক্তিতে এগিয়ে এসেছেন বটুকদা। বিষয়টা তাঁর কোন সতীর্থর চোখে এমনিভাবে ধরা পড়ে ছিল :

*.....গান রচনার ক্ষেত্রে এ-পর্বের মহত্তম সৃষ্টি বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রের 'নবজীবনের গান'। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাকা গাঁথুনীর উপরে জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গীত চর্চার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি একজন নাম করা শিল্পী। আবার সেই সঙ্গে তিনি একজন সুরকার ও আধুনিক কালের বিদগ্ধ কবি। এই সমন্বয়েরই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে 'নবজীবনের গানে' (তাঁর পরবর্তী 'মিছিলের গান'ও এক মহৎসৃষ্টি)। —চিন্মোহন সেহানবশী, ৪৬ নং (১০৭০) পৃ. ২৩।* সে কি রক্ত-পাগল-করা গান। জ্যোতিরিন্দ্রের তখন ভরা যৌবন, কণ্ঠে তখন সপ্তসুরের বিচিত্র-লীলা-তরঙ্গ। ৪৬ নং-এর মহড়ায় সেই বিচিত্র প্রাণের বর্ণময় রোদ্দুর পড়েছিল ছড়িয়ে!

*৪৬নং-এ এক সন্ধ্যায় জোর মহড়া চলছে নাচের; বোধহয় নবজীবনের গানের সঙ্গে। জ্যোতিরিন্দ্র তালিম দিতে দিতে নিজেই নাচতে শুরু করেছেন মেতে উঠে। তার রাশি রাশি বাবরি চুল উঠছে পড়ছে নাচের তালে। খুব জমে উঠেছে মহড়া। ঘড়ির দিকে নজর করার ফুরসৎ নেই কারো। এমন সময়ে দরজার দিকে একটা চাপা আর্তনাদ শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি ঠিক নিচের তলার বুড়ি মেমসাহেব উঠে এসেছেন.... দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে... বললেন 'Look, what you have done to our dinner' প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই হৃদয়বিদারক দৃশ্য— সুপের উপরে চুন ও প্লাসটার খসে পড়েছে গণনাট্যের নটরাজদের দাপটে।* — ৪৬ নং পৃ ২১।

## দুই

সেটা ছিল বিদেশী শাসনের নৃশংসতম অধ্যায়। বোমারু বিমান হানা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কলকাতার আকাশে। শহর নিষ্প্রদীপ। গণিকাবিলাসে শহর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় উন্মত্ত মিলিটারী বুটের চাঞ্চল্য বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছে মুহুর্মুহু। আর ভয়াবহ মন্বন্তরের মারাত্মক ষড়যন্ত্রে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। হুমকি দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের অতর্কিত আক্রমণ এবং জাপানী সাম্রাজ্য-লিপ্সা পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দেবার। সে আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃটিশ-শাসিত ভারতবাসীর মনও আন্দোলিত করেছিল। ফ্যাসিজ্‌মের বিপদের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটনে জ্যোতিরিন্দ্ররা ছিলেন অতন্দ্র। বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন রায়, বটুক (জ্যোতিরিন্দ্র) বিনয়-দেবব্রত (জর্জ), সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সহ অজস্র সুহৃদ সে দুর্দিনের বন্ধুরূপে ৪৬ নম্বরের আন্দোলন দৃঢ় করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র-মানসিকতার এই পটভূমিকার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক পরিবেশও সক্রিয় ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ছ'বছর পরে অবিভক্ত বাংলাদেশের পাবনা জেলার শিতলাই গ্রামে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন কেটেছিল গ্রামে ও শহরে, পরে কলকাতায়। বিজ্ঞানের স্নাতক (১৯৩১) হয়েও ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠ গ্রহণ করেন (১৯৩৫)।

বনেদী জমিদার বংশের আভিজাত্য নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র যে মনস্ক জগতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাতে অনুভবের বিশাল অবকাশও যুক্ত হয়েছিল। বহু জ্ঞানী গুণী শিল্পী ও সাহিত্যিকের সংস্পর্শে সহজেই এসেছিলেন। ভীষ্মদেব, অনাদি ঘোষ দাস্তিদার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নিকট যথাক্রমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন। সূক্ষ্ম রুচিবোধের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিহ্নিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।

মিলনসাগর
www.milansagar.com


গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ, ভালবাসা। এই দ্বৈতরূপের মানসিকতার একদিকে ছিল পারিবারিক বনেদি জমিদারী আভিজাত্য, অন্যদিকে ছিল প্রগতি তথা গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক। নাগরিক মনের সঙ্গে গ্রাম বাংলার দিগন্ত এসে মিশে তৈরি করে ছিল এমন এক ব্যক্তিত্ব যার দোসর বিরল। সেখানে ফনিমনসার ক্ষেতে ক্ষেতে ঘোরে কাক/শৈবাল-মাটির মৎসগন্ধী হয়,/কাশফুল-বন/... মোহানা পেরিয়ে বাঁক, নৌকা সারি সারি,/ডিমি ডিমি ঢাক ঢোল কাঁসি উলুধ্বনি—/বাঁশ ঝাড় ঘেরা গ্রাম/আশ্বিন আকাশ আর চলন বিলের পার— অলোক-দুয়ার/ চৈত্র গাজনে মাদল মত্ত ডমরু বাজায়॥/ রাতগুলো নরম মোলায়েম ঘাসের মত/কুমুদে, কহ্লার পদ্ম নীরবে ফোটায়।/ অথবা, বশির মিঞা, নিকারীর জালে/মাছ ধরে ধরে, হুঁকা নিয়ে বসে—/বনের গান আর রোদ্দুর লাগা ডানার গন্ধ/দূর অরণ্যানীর সবুজ-হল্‌দে-নীল-লাল।/ গহনার নৌকা করে প্রতিমারা পিতৃগৃহে আসে/সবে ভুলে গিয়ে, আশ্বিনের সোনার সকাল/ডাক সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল/শির্‌শিরে শিউলি সকাল আর বিকালের হৃদয়ের কাছে ঘেঁষা ছুটি-ছুটি-মন।

আবার :

যদিও গভীর রাত্রে ট্যাক্‌সি থেকে নামি
স্খলিত চরণে
মাত্রাশূন্য উচ্চারণ টলে টলে ফেরে
মন হতে মুখে— —*বহুব্রীহি/ রাজধানী ও মধুবংশীর গলি।*

হোটেলওলারা সব পাজি।
দৈনিক দ্বাদশ মুদ্রা গুণে নেবে ঠিক,
তবু যদি শালাদের লোভ কিছু কমে,
বিয়ারেতে একষ্ট্রা ফি নেবে এক টাকা! —*স্বস্তিবচন/ রাজধানী ও মধু... গলি।*

মত্ত আততায়ী আসে— রাত্রি
অনন্ত পথযাত্রী,—
মিলিটারী লরীর ঘর্ঘর,
রিকশ'র নূপুর, সুদূর ট্রামের ঘর্ঘর,
ধাবমান মোটরের ক্ল্যাক্‌সন্ হর্ণ, আর

মেঘে মেঘে এরোপ্লেনের শব্দের ভার
আকাশ ছেঁড়ে; —মধুবংশীর গলি/রাজধানী ও মধু....গলি।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে জ্যোতিরিন্দ্রের কবিতার মৌল জাদু প্রথমত তাঁর তর্কাতীত বৈদগ্ধ্যের প্রকাশে। এবং দ্বিতীয়ত মানবতাবোধে। কম্যুনিইজ্‌মের প্রত্যয়, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস তাঁর রচনায় অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু ছাপিয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের কথা। জ্যোতিরিন্দ্র প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত, অভিজাত-রুচি-মনস্ক কবিতা লিখেছেন। অথচ অতি সহজেই নেমে এসেছেন অতি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবনে। এক কথায় তাই জ্যোতিরিন্দ্র *People's Paet* —জনতার কবি। এক আশ্চর্য সহজ স্বভাবে অনায়াসে জ্যোতিরিন্দ্র তাই ঢুকে যান অভিরাম পালের দারিদ্র্য নিষ্পেষিত সংসারে।

বাড়ী ভাড়া বাকী কয়মাস, তবু
রুগ্‌ক্লান্ত দেহটুকু ঘিরে

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিন্তিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।

মিলনসাগর
www.milansagar.com



অত্যাশ্চর্য আবরণ নিয়ে ঘোরে
তালি দেওয়া অস্তিত্বের সামগ্রী সংগ্রহে—
অভিরাম পাল।
লগ্নজ্বরী কন্যা তার।
স্ত্রীও ধোঁকে শ্বাস রোগে।
... ... ... ... ....
এই তো সেদিন,
ছোট ভাই মারা গেল গুলি খেয়ে
ওদিকে, অনেক রাত্রে ফেরে
একদা সুন্দরী তার বোন—
তনিমাকে চেনে সব পাড়ার ম'স্তান।
..... ..... .....
ভুলে গেল,
আজ কাল পরশুর কথা ভুলে গেল।
..... ... ..... .....
সব ভুলে গিয়ে, আশ্বিনের সোনার সকাল
ডাক সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল॥

—*ডাক সাজ.....পাল/ যে পথেই যাও ১৯৭৩/১৯-২০।*

'পৃথিবীর প্রথম আলোর মত' জ্যোতিরিন্দ্র 'সহজ এ আনন্দিত মনকেও' চেনেন আর চেনেন বলেই সহজেই বলেন : *ছোট্ট এক মেয়ে ঠোঙা থেকে মুড়ি নিয়ে একটু একটু খায়—/আর আকাশের চঞ্চল সবুজ ঘুড়ির উড্ডীন আনন্দের দিকে তাকিয়ে থাকে।*

আবার সমাজের অবক্ষয়ে, মানুষের জীবনের অপচয়েও কবি অস্থির হয়ে ওঠেন।

*ওদিকে দেখি বিস্ফোরণের মুখভর্তি রক্ত থলো থলো/হঠাৎ লাগা গুলির ঘায়ে*
*ফুটপাতের ঐ যক্ষারোগী বুড়োই বুঝি ম'লো*
*শুনছো কোনো ষষ্ঠীর ঢাক বাজছে বোধনে /সমাজ দেশ ইতিহাস কাঁপছে ঝোড়ো হাওয়ায়।*

কিন্তু কবি কোন কিছুতেই শুভ মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস হারাননি, প্রবল আশাবাদী শুভাকাঙ্ক্ষী জীবনের কবি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। নিজের রক্তের প্রবাহে তাই অটল বিশ্বাসের কথা উচ্চারিত হয়—

আমরা অপেক্ষা করবো— হাতে হাত দিয়ে—
অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে
আলোকের অজস্র বিপ্লবে
সূর্যোদয় মুকুট পরা উঠে আসবে
পরিপূর্ণ প্রচণ্ড মানুষ।

সমাজের এবং জনতার অবক্ষয় আর অসুখে আন্দোলিত কবি নিজের আত্মমগ্ন *'Lyrical tune'* কবিতায় ধরে দিয়েছেন কম। এটা তাঁর আপন ব্যক্তিত্বেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। ব্যক্তি 'বটুক-দা'কে যাঁরা অতি নিকটে থেকে জেনেছেন তাঁরা সকলেই জানেন 'বটুক' কোন দিন কাউকে নিজের দুঃখের, কষ্টের কথা ব'লে ভার-মুক্ত হ'তে চাননি। বিত্তবান বংশের গুণী সন্তান হয়েও কখনো বিত্তমুখীন সুখী জীবন যাপন করতে চাননি। এক চির-রোমান্টিক, চির-চঞ্চল প্রাণ তাঁকে সব জাগতিক সুখ সম্পদ থেকে ছিন্ন-বাঁধা পলাতকের মত, লাগাম-ছেড়া অশ্বের মত

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিহ্নিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।

মিলনসাগর
www.milansagar.com



কেবল ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের সীমায়, এ-বৃন্ত থেকে ও-বৃন্তের আশ্রয়ে। কোথাও বাসাবাঁধা হল না তাঁর। কলকাতার উত্তাল উত্তেজনার শেষে বোকারো'র 'অদ্ভুত ভূগোলে শাল মহুয়া পলাশের অরণ্য-সন্ধ্যায়' অথবা দিল্লীর ফরসীর নল মুখে চম্‌কে ওঠা নাজির হাসানের সান্নিধ্যে ক্ষণিকের মগ্ন-চৈতন্যে অস্পষ্ট অনুভব প্রকাশিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার বলয় অনেক বড়। ঐতিহাসিক। সেই প্রথম দিককার মধু বংশীর গলির বিস্তৃতির মতো।

সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে কবির চেনা ভূগোলেরও মানচিত্র বদলায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের এক হাতে দিনের তারুণ্য অন্য হাতে রাত্রির প্রাজ্ঞময়তার মশাল। অনির্বাণ জ্বলে। প্রজন্ম ব্যবধানের যন্ত্রণা মুক্ত ছিলেন তাই।

*... । স্পষ্ট তরুণ— দিন বলিষ্ঠ— কিশোরের মত আমার প্রৌঢ়ত্ব নিয়ে কিছু কিছু বক্রোক্তি করে। কিন্তু তোমাকে স্পষ্ট ভাবেই জানাই— আমি অনন্তকাল ধরে বুড়ো হতে থাকবো— এক হাতে দিন আর অন্য এক হাতে রাত্রিকে ধরে। এক হাতে কাজ আর অন্য এক হাতে শ্লথ গতি মায়ের মুঠি ধরে। অনন্তকাল।*

আর ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত যে জ্যোতিরিন্দ্র গলায় রক্ত তুলে শহরে, গ্রামে, নগরে ও গঞ্জে, হাটে, পথে মাঠে ও ঘাটে, রোদে, জলে, দিনে ও বিকেলে হেঁটে হেঁটে অখণ্ড স্বাধীনতার, ফ্যাসিজমের করাল গ্রাস-মুক্ত মানব-জীবনের বিপ্লবের গান গেয়ে বেড়িয়েছিল সেই গণনাট্যের নবজীবনের গান ও সুরের গুরু মধুবংশীর গলির সম্রাট ১৭৭৩-৭৪-এ এসে 'রাখুরাম এক তথাকথিত মানুষের পরিণতি পেল!' পেল কী? আপাত সমীকরণে তাই মনে হয়

সমস্ত দেশ একটা অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ডের
গল্পের শেষ পাতা।

আর যে জীবন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় অস্থির সে-জীবনে কোন সৃষ্টিশীল কাজও হয় না। অথচ মানুষের জীবনের সময় অপেক্ষা করে না। কবির চোখে সমাজের এই ভয়াবহ অবক্ষয় মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে উপস্থিত।

*বৈদগ্ধ্য কাব্য সূক্ষ্ম শিল্পসত্তা গ্রন্থিল*

এই ধারণায় স্পর্ধিত সমীকরণ উঠে এলেও আমরা যখন কবির আর্তউচ্চারণ শুনি—

এখন মড়া শবের গন্ধে আনন্দিত হতে হবে— তাই
একটা গানের কলি নিয়ে ভাবতে থাকি— কখন
বেঁচে থাকতে থাকতে ইতিহাস হয়ে উঠবো
পরের বোঝা বইতে বইতে কখন একেবারে আয়ুর
শেষ দিনের চূড়ায় জ্বলে উঠবো।। — এ কোন্ জ্যোতিরিন্দ্র?

এ কী জীবন বিমুখতা ? কিন্তু হার না-মানা জ্যোতিরিন্দ্রকে যাঁরা আরও নিকট থেকে জেনেছেন তাঁরা তো চেনেন। জগতের সমস্ত কবি শিল্পী সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞরাই জীবনে কখনো না কখনো কোন না কোন *dichotomy* তে যুক্ত হয়েছেন। 'টু বি অর নট টু বি'র মানবজীবন সত্য।

আসলে আজীবনের যে সত্তা মানুষের জন্য সমর্পিত, তা যতই রোমান্টিক কল্পনায় সুষমিত হোন্ না কেন, যে সত্তা প্রত্যয়ী রাজনৈতিকতায় আচ্ছাদিত হোন্ না কেন তাঁর অন্তর মূল সম্পূর্ণ রূপে অটুট থাকে। তাইতো আমাদের জীবন থেকে মানুষের মৃত্যু মানবতার মৃত্যু ঘটায় না। জ্যোতিরিন্দ্রও তাই মানবতারই মিলন মেলায় আমাদের আহ্বান করেন—

দেখবে, তীব্র প্রতিবাদ আর শপথগুলি
ফুল হয়ে, গান হয়ে

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিন্তিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।

মিলনসাগর
www.milansagar.com



কল-কোলাহলের উচ্চ চূড়ায়
হাহাকারগুলোকে জীবনের উদ্দাম হাসিতে
পরিণত করে—
সহস্রবাহু হয়ে ডাকছে তোমাকে এই মেলায়,
যে পথ দিয়েই যাও।— (যে পথ দিয়েই যাও, পৃ. ৪৭)।

সচেতন কবি তাতে বিহ্বলিত হন না। যথেষ্ট সাবধানী উচ্চারণে বুকের চাপা কান্নায় মেলে ধরেন সেই অমোঘতা—

সময় এলো কি আজ।
ভস্মীভূত হৃদয়ের মীনকেতু সহসা উধাও দেখি,
প্রণয় বিহ্বল,
যুগান্তের কূলপ্লাবী আবেগের ঝড়ে।
ঊর্ধ্বে যবে মরণের লক্ষ লক্ষ বীজ
পক্ষ ঝাড়ে মারণলীলায়,
শ্রেণী নির্বিশেষে নর করে হায় হায়,
নিবিড় সময় শুধু হাতে আছে কয়েক মিনিট,
হৃদয়, হৃদয়, মোর!
ইউলিসিস হৃদয় আমার!

তার পর? দুহাতে আবেগ ঘনানো নীল ঝড়ে ঢাকা মেঘেদের ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে স্পর্ধিত কবি কণ্ঠে ঘোষিত হয় "আঃ চুপ করো, একটু তোমরা চুপ করবে? প্লিজ! যত সব বেলেল্লাপনা—"

কোন এক বোধ এসে শেষ পর্যন্ত কবিকে উচ্চারণ করায় "মনের সংকট ভুলে, পথে পথে জীবনকে আলিঙ্গন করো।/কারণ, এ জীবনই তো জীবনের আততায়ী হবে।/ কোনও একদিন।"

*তখন কেবল একটু খুঁজো কাঁটা স্তূপ আবর্জনা পাথরের আনাচে কানাচে/ অঞ্জলির একটি শুভ্র ফুল।*

সারাটা জীবন যে লোকটি মানব-মমতায় আর সাধারণ জনতার দুঃখে খেটে, ঘেমে নেয়ে উঠেছিল; যে মানুষটির আকাশের মত অমল শৈশব-সারল্য ছিল, যে কোনো মুহূর্তে যে কোন মানুষের দুঃখে কেঁদে উঠে এক মুহূর্তে পরকে আপন করে নিতে পারতো;— যে লোকটি রোদে জলে রাতে, সন্ধ্যায় শহরে ও গ্রামে, গঞ্জে ও নগরে অবাধে আনন্দে নীল অথবা ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ মাথায় করে মানুষের গান শোনাতে ছুটে গেছে; তার সীমা কেবল তার কাব্যকীর্তির মধ্যে সীমিত নয়। কেবল তার অপ্রমেয় সুরের আগুনের মধ্যে তা বিচার্য নয়। সব মিলিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র। তাকে খণ্ড করতে গেলেই তাঁর ভাষায় একটা পারিবারিক খণ্ড সত্য এসে আমাদের জীবনে বিকাল এনে দেয়।

সেদিনও এমনি পথিক, কবি, প্রাণিত মানুষ সহযাত্রীদের আনন্দময়তার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। করমণ্ডল রাত্রির অন্ধকার চিড়ে উদ্দাম গতিতে ধাবমান। ঘন ঘুমের আচ্ছাদনে জ্যোতিরিন্দ্রের আয়ুর ট্রেন নিয়ে আরও এক অবাধ্য সময়ের ট্রেন আরও মসৃণ আরও উদ্দাম গতির স্রোতে উধাও হয়ে যায়। ঘন অন্ধকারের আস্তরণ ছিঁড়ে অ্যাকবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে— তুমিও কী বুঝতে পেয়েছিলে, .... *জীবনই তো জীবনের আততায়ী হবে কোনও একদিন।*

আপনারা কী আমাদের জীবনের স্তূপীকৃত আবর্জনা, পাথরের আনাচে কানাচে আজও একটি অঞ্জলির শুভ্র ফুল দেখতে পান? যদি দেখতে পান তাহলে আজও জ্যোতিরিন্দ্র আমাদের জীবনে সাম্প্রতিক।

আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ নবেন্দু সেনের কাছে, তাঁর "চিহ্নিত উচ্চারণ" বই থেকে এই লেখাটি এখানে পুনঃপ্রকাশিত করার অনুমতি দেবার জন্য।